আয়াত আলী খাঁ
মোহাম্মদ হোসেন খসরু
কমল দাশ গুপ্ত

With the best compliments of
BANGLADESH SHILPAKALA ACADEMY
Ramna, Dacca.

বাংলাদেশ সঙ্গীত সিরিজ : ২

আয়াত আলী খাঁ

মোহাম্মদ হোসেন খসরু

কমল দাশগুপ্ত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

আয়াত আলী খাঁ

আবুল কাশেম মুহম্মদ মুজতবা

মোহাম্মদ হোসেন খসরু

আবদুল মতিন

কমল দাশগুপ্ত

আবদুল মতিন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমীর, একাডেমী পুরস্কার ঃ সঙ্গীত সাধক, কার্যক্রম অনুসারে ১৩৮৪ সালে সঙ্গীত সাধক--গুল মোহাম্মদ খান, কানাইলাল শীল এবং ফুলঝুরি খানকে তাঁদের সাধনার প্রতি মর্যাদা স্বরূপ একাডেমী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে।

১৩৮৫ সালে আরো তিনজন সঙ্গীত পুরুষ--- আয়াত আলী খাঁ, মোহাম্মদ হোসেন খসরু এবং কমল দাশগুপ্তের প্রতি এ সম্মান প্রদর্শন করতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত।

শিল্পকলা একাডেমী ভবিষ্যতেও অনুরূপভাবে দেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত সাধকদের সাধনা ও সম্পদকে মর্যাদা ও সম্মান করতে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শহীদুল ইসলাম
পরিচালক
সঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগ

কমল দাশগুপ্ত

(১৯১২--১৯৭৫)

আবদুল মতিন

"কদম-কদম বাঢ়ায়ে যা" এই রণ সঙ্গীতের সুর শুনে শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন এর চেয়ে ভাল সুর আমি কল্পনাও করতে পারি না। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর গোল্ডেন জুবিলীর শ্রেষ্ঠ গানটি তাঁকে দিয়েই রেকর্ড করিয়েছিলেন। ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় সঙ্গীত জগতে একটা কথা প্রবাদ বাক্যের মতই চালু ছিল। কথাটা হলো: যত চেষ্টাই করোনা কেন শেষ পর্যন্ত দেখবে কমল দাশগুপ্তের ঘর ঘুরে না এলে কিছুই হবে না। এই সঙ্গীত শিল্পীই জীবন সায়াহ্নে ঢাকায় পথিকার নামে একটি ছোট্ট স্টেশনারী দোকান খুলেছিলেন জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে। কর্মব্যস্ত নাগরিক হাল্কাভাবে জিজ্ঞেস করতো: আপনার দোকানে ভাল দাঁতের মাজন আছে?—ইতিহাসের চাকা এমনি অভাবনীয়ভাবেই গড়ায়, ইতিহাসের শিক্ষাই এই!

জনপ্রিয় নাম কমলদা। পোষাকী নাম কমলপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। বিশের দশকের শেষ দিক থেকে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত উপমহাদেশের সঙ্গীত আকাশে একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে জ্বল জ্বল করতেন। সুরস্রষ্টা, নজরুল-গীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার, গীতিকার, যন্ত্রী, ও সঙ্গীত শিক্ষক কমলপ্রসন্ন দাশগুপ্ত তাঁর সমসাময়িককালের সঙ্গীতসেবীদের মধ্যে তর্কাতীতভাবে অন্যতম বা শ্রেষ্ঠ এ কথায় বিতর্কের অবকাশ নেই।

কমল দাশগুপ্তের পৈত্রিক নিবাস যশোর জেলার বেন্দা (কালিয়া) গ্রামে। কমলবাবুর পিতা তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত বেন্দা থেকে কুচবিহার চলে আসেন এবং সেখানেই ১৯১২ সালের ২৮শে জুলাই কমল দাশগুপ্তের জন্ম। তাঁর পিতামহের নাম কামিনীরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁর পিতৃব্য কিরণদাশ গুপ্তের সঙ্গতে সুনাম ছিল। কমল দাশগুপ্তরা পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিমল দাশগুপ্ত ছিলেন সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। তিনি এইচ. এম. ভি-এর টুইন রেকর্ড বিভাগের প্রশিক্ষক ছিলেন। বিমল দাশগুপ্ত একজন খ্যাত-নামা যাদুবিদ্যা বিশারদও ছিলেন। গ্রামোফন রেকর্ডে কমেডিয়ান বলে তাঁর একটা বিশেষ পরিচিতি ছিল। কমলের অনুজ সুবল দাশগুপ্তও সঙ্গীতে বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাংলা খেয়ালসহ বহু গানে কন্ঠ দিয়ে তিনি যশস্বী হয়েছেন। দুই ভাই চাঁদ-সুরুজ কাওয়াল নামে বেতারে কাওয়ালীও

গেতেন। কমল দাশগুপ্ত ও সুবল দাশগুপ্তের গীত টুইনরেকর্ডে দুটি বাংলা খেয়াল আজও রাগসঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের চমক লাগায়। অনুজা সুধীরা সেনগুপ্তাও একজন খ্যাতনাম্নী সুকন্ঠী গায়িকা। এইচ. এম. ভিতে তাঁর বহু গানের রেকর্ড হয়েছে। ইন্দিরা দাশগুপ্তাও সুগায়িকা ছিলেন।

কুচবিহারেই কমল দাশগুপ্তের স্কুলজীবন শুরু। কমলবাবুর বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ সুশীলকুমার মজুমদার বলেছেন: কমল দাশগুপ্ত ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালীন গেজেট থেকে জানা যায় যে কমলপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থ ক্যালকাটা একাডেমী থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে সময় গেজেটে তাঁর উল্লিখিত বয়স হল ষোল বছর দু' মাস।

কমল দাশগুপ্তের পিতামহ কামিনীরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং পিতা তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ধ্রুপদে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পিতৃব্য কিরণ দাশগুপ্তের হাতও সঙ্গতে খুব ভাল ছিল। অর্থাৎ গৃহেই সঙ্গীতের অনুকূল পরিবেশ ছিল। কমল দাশগুপ্তের সঙ্গীত শিক্ষার ভিত্তিও রচিত হয়েছিল বাড়ীতেই। বাল্য-কাল থেকেই তিনি সঙ্গীতের পরিবেশে গড়ে উঠেছেন। তার নিজের ভাষাতেই বলি :""এখানে আমাদের বংশের গানবাজনার কথা এবং আমাদের বাড়ীতে গানবাজনার অত্যাচারের কথা না লিখলে আসর জমবে না ; আর এই অত্যাচারের ফলেই আমাদের বংশের পাঁচ ছয়জন (ভাইবোন) অল্প বয়সেই এইচ. এম. ভিতে গান রেকর্ড করতে পেরেছে এবং তিন ভাই সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে নাম করতে পেরেছে। সেই আমলে ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে উঠলে বাপদাদারা গলা ছেড়ে গান করতেন না। তাই আমার বাবাও আমাদের ছোটকালে ভোর বেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমাদের অনেক প্রভাতী গান শিখিয়েছেন। কিন্তু বড় হয়ে আর বাবার গান শুনিনি এবং আমাদেরও গান শেখাননি। আমার বড় ভাই শ্রী বিমলদাশগুপ্ত এক অভিনব গুণের আঁধার ছিলেন। ধনুর্বিদ্যা, হিপনটিসম, হাস্য-কৌতুক, উচচাঙ্গ সঙ্গীত (খেয়াল ও টপ্পা), ভাটিয়ালী, কমিক গান ইত্যাদি কবে যে কেমন করে শিখেছিলেন তা আমরা জানতাম না।..... উচচাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি বড় ভাইয়ের খুব ঝোঁক ছিল এবং সবচেয়ে মজার কথা হলো এই যে, যখন যে গানের জন্য যে ওস্তাদের কাছে যেতেন তিনিই সে গান শিখিয়ে দিতেন কোনও আপত্তি করতেন না।.....আমাদের বংশের চার

ভাই ও দুই বোন গান গাইতে পারত। তবে আমি আমার ছোট ভাই সুবল দাশগুপ্ত এবং ছোট বোন সুধীরা দাশগুপ্তা (সেনগুপ্তা) উচচাঙ্গ সঙ্গীত শিখতাম। ১৯২৮ সালে বড় ভাই প্রথম হিজ মাস্টার্স ভয়েসে ভাটিয়ালী ও কমিক রেকর্ড করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে টুইন কোম্পানীর সঙ্গীত পরিচালক নিযুক্ত হন। এই সময় আমাদের বাড়ীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গানবাজনা হতো যারফলে দু'টি দল গড়ে উঠে। বড় দলে অগ্রজকে কেন্দ্র করে আসরজমাতেন ঁশ্রী তুলসী লাহিড়ী, গোপাল লাহিড়ী, শ্রী শচীন দেব বর্মণ, কবি শৈলেন রায়, সজনীকান্ত দাশ (শনিবারের চিঠি), আমার ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ, শ্রী হীরেণ বোস (চলচিচত্র ও সঙ্গীত পরিচালক), আব্বাসউদ্দিন আহমদ প্রমুখ সঙ্গীত শিল্পীরা; আর ছোট দলে ছিলাম আমি, সুবলদাশগুপ্ত, সুধীরা দাশগুপ্তা, শ্রী তারাপদ চক্রবর্তী (কলকাতার প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক), শ্রী সত্যেন ঘোষাল (কবি) ইত্যাদিরা।

দাদা বিমলদাশগুপ্তের কাছেই কমল দাশগুপ্তের সঙ্গীতের আনুষ্ঠানিক হাতেখড়ি। এরপর শ্রী গুপ্ত রামকৃষ্ণ মিশ্রের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছে কিছুদিন তালিম নেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংবর্ধনা উপলক্ষে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে তিনি দিলীপকুমার রায়ের গানের দলে অন্তর্ভুক্ত হন। যে দল নিয়ে দিলীপকুমার রায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গান শোনাতে গিয়েছিলেন, তরুণ কমল দাশগুপ্ত ছিলেন সে দলের অন্যতম সদস্য। কমল দাশগুপ্ত দিলীপবাবুর কাছেও গান শেখেন। অন্ধগায়ক শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কাছে তিনি তিন চার বছর সরগম সাধনা করেন। ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ কমল দাশগুপ্তের শেষ গুরু। এই সময় তিনি এইচ. এম. ভি'তে ব্যস্ত ও প্রতিশ্রুতিশীল সুরকার। ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর কাছে যখন তিনি প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করতে যান তখনই ওস্তাদ টের পেয়েছিলেন, এক অসামান্য শিক্ষার্থী তাঁর কাছে এসেছেন। উচচাঙ্গ সংগীতের খ্যাতনামা ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন এই প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীর সঙ্গীত শিক্ষার ভিৎ অনেক পূর্বেই প্রস্তুত হয়ে আছে। জমি একেবারে তৈরী, এবার দক্ষ হাতে বীজবপনের পালা। ওস্তাদজী ধরতে পেরেছিলেন তাঁর নিজস্ব ঘরো-য়ানার তালিম তিনি আগেই পেয়ে গেছেন। এই অসাধারণ ছাত্রের জন্য

তাই প্রস্তুত করলেন বিশেষ পাঠক্রম। দিবাভাগে চলতো কমল দাশগুপ্তের গ্রামোফন কোম্পানীর কাজ আর রাত্রিবেলায় ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের কাছ থেকে তালিম গ্রহণ। তালিম নিয়ে, রেওয়াজ করতে করতে বহু বিনিদ্র রজনী কেটেছে তাঁর। এই শ্রম লব্ধ শিক্ষার ধারা অব্যাহত ছিল ১৯৩৯ সালে ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের মৃত্যু পর্যন্ত। গ্রামোফন কোম্পানীর ভেতরে ও বাইরে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীই জমিরুদ্দীন খাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। কন্ঠ সঙ্গীতে অনেকে কমলদাশগুপ্ত অপেক্ষা অধিক পারদর্শিতাও লাভ করেছেন কিন্তু ঠুমরীরাজ জমিরুদ্দীন থেকে কমল দাশ যত বেশী পরিমাণ সুর সম্পদ আহরণ করেছেন তেমন আর কেউ পারেননি। সুরের গূঢ়তম রহস্য তিনি এমন নিপুণ মুন্সিয়ানার সাথে স্বীকরণ করেছেন যে, বাংলা ও হিন্দী গানে সে সুর প্রয়োগ করতে তার এতটুকু কষ্ট হয়নি। দিলীপ কুমার রায়ের কাছে তিনি শিখেছিলেন, সুরকার তথা সঙ্গীত শিক্ষকের ধৈর্য-শীলতা এবং প্রত্যেক শিল্পীর নিজস্ব কন্ঠবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতনতা। এ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রসোমের একটি বিশেষ উক্তি পত্রস্থ করতে পারি: গ্রামোফন কোম্পানীতে যাঁরা গান করেন তাঁরা সবাই জমিরুদ্দীন খাঁর ছাত্র, কিন্তু জমিরুদ্দীন খাঁর একমাত্র ছাত্র কমলদাশগুপ্ত।

প্রতিভার বিকাশের জন্য উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন। যুগে যুগে পরিদৃষ্ট হয়েছে, বহু প্রতিভাধর ব্যক্তি তাদের সীমিত কর্মক্ষেত্রের জন্য বিকাশের তুঙ্গে আরোহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রতিভার নিশ্চিত পরিস্ফুটনের জন্য আধার প্রয়োজন। গ্রামোফন কোম্পানী ছিল কমলদাশগুপ্তের সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশের সেই আধার, তাঁর প্রতিভার বিকাশের সহায়ক।

কমল দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিমল দাশগুপ্তের সঙ্গে গ্রামোফন কোম্পানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। এখানে তিনি ছিলেন ট্রেনার। কি করে গানের রেকর্ড এবং সুর করা হয় এইসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিমল দাশগুপ্ত অনুজ কমল দাশগুপ্তকে গ্রামোফন কোম্পানীতে নিয়ে যেতেন। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুধাম রিহার্সাল রুমটি ছিল কোম্পানীর চিৎপুর রোডস্থ বাড়ীতে। এই সব স্টুডিওতে সেকালে সেসন্যাল রেকর্ডিং হতো। বছরে কয়েক মাস এক নাগাড়ে রেকর্ডিং হতো আবার

দু'চার মাস রেকর্ডিং বন্ধ থাকতো। বিমল দাশগুপ্ত টুইন বিভাগের ট্রেনার ছিলেন বটে কিন্তু যাদু প্রদর্শন উদ্দেশ্যে তাঁকে ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো; প্রায়ই তিনি অনুপস্থিত থাকতেন। দাদার অনুপস্থিতির জন্য জমাকৃত কাজগুলো কমল দাশগুপ্তকে করতে হতো। বিমল দাশগুপ্তের অনুপস্থিতিতে অনেক নতুন শিল্পীকে দিয়েও তিনি সুর শিখিয়ে রেকর্ড করাতেন। দেখা যেত বিমল দাশগুপ্তের জন্য রক্ষিত নির্দিষ্ট সংখ্যক গানের শতকরা চল্লিশভাগের সুরারোপ ও রেকর্ড কমল দাশগুপ্ত সেরে ফেলেছেন। এতে দুদিকে সুবিধা, তাঁর দাদার চাকুরীও বজায় থাকত এবং তাঁর সঙ্গীত শিক্ষাও এগিয়ে যেত। তখন ১৯৩০ সাল।

টুইনের হিন্দী ও উর্দু বিভাগে মুন্সী আবদুল ওয়াহিদ নামে একজন বিচক্ষণ ও গুণী ব্যক্তি কাজ করতেন এবং ভাল বাংলাও জানতেন। তিনি তরুণ সুরকার কমল দাশগুপ্তের প্রতিভা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ও আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেন। ১৯৩২ সালে সর্বপ্রথম কমল দাশগুপ্তের নিজের সুর করা গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয় সত্যবতীর (পটল) কন্ঠে। তাঁর গান দুটি হল:

গানের মালা গেঁথে গেঁথে···
কতকাল আছি চেয়ে চেয়ে···

এর কিছুদিন পর অর্থাৎ '৩২-এর সেপ্টেম্বরেই তাঁর নিজের কন্ঠে প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়। শ্রী গুপ্তের প্রথম রেকর্ডকৃত গান দুটি ছিল বাংলা গজল:

কোন স্বপন লেগেছে আমার···
কত জ্বালা সব বল না···

এই রেকর্ডটি প্রকাশিত হয় মাস্টার কমল নামে এবং বেতারের তরুণ গায়ক বলে। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য সংযোজিত হতে পারে, যে ঐতিহাসিক দিক থেকে শ্রী কমল দাশগুপ্ত আগে সুরকার পরে গায়ক।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ এর শুরু পর্যন্ত কমল দাশগুপ্ত টুইন বিভাগে কাজ করে যেতে থাকেন। প্রতি সেসনে তাঁর সুর করা গানের সংখ্যা দাঁড়ায় ষাট-সত্তরে। অপর দুই ভ্রাতা ভগ্নী সুবল দাশগুপ্ত ও সুধীরা সেনগুপ্তা এবং নিজের কন্ঠে অনেকগুলো রেকর্ড তখন প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪ সালে কোম্পানী টুইন ও হিজ মাস্টার্স ভয়েস—এই দুই রেকর্ডিং বিভাগকে যুক্ত করে এক ব্যবস্থাপনার অধীনে আনেন দুই বিভাগের সংযুক্তি কমলদাশ গুপ্তকে বেশ অসুবিধায় ফেলে। এই তরুণতম সুরকারের জন্য আর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাজ অবশিষ্ট থাকল না। কিন্তু মুন্সী আবদুল ওয়াহিদ কমল দাশগুপ্তের প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করেন। তাঁর সহযোগিতার ফলে কমল বাবু হিজ মাস্টার্স ভয়েস লেবেলে আটটি গানের সুর করার দায়িত্ব পান।

বিশেষ ধারা

চলতি শতকের ত্রিশের দশকে বাংলা গানে নানা প্রকারের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। বিশেষ করে আধুনিক গানে এই পরীক্ষা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। খাঁটি অর্থে ত্রিশের দশকের আগে মনোমুগ্ধকর আধুনিক গান বলে তেমন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। রবীন্দ্র সঙ্গীত তখনও আপন বৈশিষ্ট্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি বা রবীন্দ্র সঙ্গীতের বোদ্ধা সমাজ তখনও পর্যন্ত দানা বেঁধে উঠেনি। কাজী নজরুল ইসলামের গান ও তখন শৈশব কাটিয়ে উঠে নজরুল গীতিতে পরিণত হয়ে শ্রোতাদের মনোতুষ্টি করতে পারেনি। ত্রিশের দশকেই শুরু হয় বাংলা কাব্য সঙ্গীতের নবায়ণ। রবীন্দ্র সঙ্গীত সবে বেতার ও গ্রামোফন রেকর্ডের মাধ্যমে তরুণ সমাজে আলোড়ন আনয়নে ব্যস্ত। এই সময় দিলীপকুমার বাংলা গানে আরেক নবধারার প্রবর্তন করেন। কথা ও সুর থেকে অধিক প্রাধান্য পেল দিলীপ কুমারের গীত ভঙ্গী। কাব্য সঙ্গীতের গভীরতর রূপের ছটা প্রকাশিত হতে লাগল বিদ্রোহী কবির সুরে ও কন্ঠে। এই দশকে আরো কয়েকজন প্রতিভাশালী গীতিকার ও সুরকার তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদানে বাংলা গানকে জনপ্রিয় ও সুসমৃদ্ধ করে তুলেন। নিউ থিয়েটার্স কে কেন্দ্র করে রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজকুমার মল্লিকের ঐকতান-বাদন ও বিশেষ নাট্যমুহূর্ত উপযোগী সুর সৃষ্টি বাংলা কাব্য সঙ্গীতে এক অভিনব ধারার সূচনা করে। এই সময়ই সুরসাগর হিমাংশু দত্ত হিন্দুস্তানী রাগ-সঙ্গীতকে সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রেখে স্বকীয় বিস্ময়কর প্রতিভার যাদু বলে রাগ সঙ্গীতের ঐশ্বর্য ও কাব্য সঙ্গীতের অপূর্ব মননশীল সংমিশ্রণ ঘটান। শচীনদেব বর্মণ এই ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী। তবে তিনি সুর সৃষ্টি করেন আর একটু বিশেষ মুন্সিয়ানার

পরিচয় দিয়ে। তিনি ভীষ্মদেব ও কৃষ্ণচন্দ্র দেবের সুরসৃষ্টিকে আত্মীকরণ করেছেন। শচীনদেব বর্মণ কাব্য সঙ্গীতের সঙ্গে লোক সঙ্গীতের বিস্ময়কর ঐক্যবিধান করেছেন। গীতিকার ও সুরকার অনিল ভট্টাচার্যও বাংলা গানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। এই যখন বাংলা গানের অবস্থা সেই সময়ে কমল দাশ গুপ্ত আপন প্রতিভাবলে বাংলা গানে প্রবর্তন করলেন এক অভিনব মনোমুগ্ধকর চমক লাগানো, শিহরণ জাগানো নতুন ধারার। এ সফল যাত্রাপথে কমল দাশগুপ্ত একা। এখানে কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সব গান থেকে তাঁর সুরারোপিত গীত যেন গান অন্যরকম। তাঁর সুর পরিকল্পনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

সঙ্গীত সৃষ্টিতে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৭ কমলদাশগুপ্তের সক্রিয় কাল। এই সময়কালে তিনি গ্রামোফন রেকর্ড ও চলচ্চিত্র মিলিয়ে চার হাজারের বেশী গানে সুর করেছেন। তাঁর এই সুর সৃষ্টির পরিধি বিস্তৃত হলেও সময় ছিল সীমিত। বিস্ময়ের সাথে বলতে হয় এই তের চৌদ্দ বছরের পরিধিতে তিনি আপন বৈশিষ্ট্য সযত্নে রক্ষা করে বহু এবং বিচিত্র গান তৈরী করেছেন।

কমল দাশগুপ্তের সুর সাধনা ক্রীড়ারত হংসের মত। বিশুদ্ধই হোক আর অপরিচ্ছন্নই হোক পানি তার দেহে লাগেনি। হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও তৎকালীন কলকাতার বর্ষীয়ান ও বিখ্যাত সুরকারদের প্রভাব তাঁর উপরে পড়েনি। তাঁর প্রধান শিক্ষাগুরু জমিরুদ্দীন খাঁর প্রভাবও সরাসরি তাঁর উপরে পড়েছে বলে পরিদৃষ্ট হয়না। তবে দিলীপকুমার রায়ের কন্ঠস্বরের সঠিক প্রয়োগ নৈপুণ্য ও সুর শৈলীর ছিটেফোঁটা প্রভাব তার গানে দেখা যায়। তাঁর নিজস্ব ঘরানা অর্থাৎ পিতা ও পিতামহের ধ্রুপদ চর্চা বা বাংলা টপ্পার কোন প্রভাবও তাঁর ওপর পড়েছিল বলে বোধ হয় না। তবে, লোকবাংলার কীর্তন, বাউল ও এ জাতীয় গানের কিছুটা প্রভাব তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে।

সাফল্যের পথ কণ্টক মুক্ত নয়। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে, গৌরবের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে বহু বন্ধুর পথ অতিক্রম, বহু অন্তরায়ের দেয়াল ভাঙতে এবং প্রতিবন্ধকতার সিঁড়ি পেরুতে হয়।--অপমান ও হৃদয়হীনতার ছায়া মাড়িয়ে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হয়। গ্রামোফন কোম্পানীর চার দেয়ালের মধ্যে অবস্থান করে কমল দাশগুপ্তকে তাই করতে হয়েছে। মুন্সী আবদুল ওয়াদুদ সাহেবের সহায়তায় ১৯৩৪ এর প্রথম দিকে হিজ মাস্টার্স ভয়েস

লেবেলে কমল দাশগুপ্ত আটটি গানের সুর করার দায়িত্ব পান। সিদ্ধান্ত হল যে এই আটটি গানের চারটি রেকর্ড ও তার নিজকন্ঠে গীত দুটি গানের একটি রেকর্ড দুর্গা পূজা উপলক্ষে বাজারে যাবে। এই ক'টি গানের জন্য কমলদাশগুপ্ত শিল্পীর এক তালিকা তৈরী করেন শ্রীমতী কমলা ঝারিয়া, মাণিকমালা, হরিমতী এবং নবাগতা শ্রীমতী যূথিকা রায়কে নিয়ে। কমলা ঝারিয়া এই অল্প বয়স্ক সুরকারের সুরে গান গাইতে অস্বীকার করেন। অতঃপর প্রণব রায় রচিত দুটি গান তাঁর জন্য তুলসী লাহিড়ীকে দেওয়া হল। কমলা ঝারিয়ার স্থানে কমলবাবুরা চার ভাইবোনে গাইলেন দুটি সমবেত আগমনী গান। শ্রীমতী যূথিকা রায়ের কন্ঠও ছিল অপূর্ব। ইতিপূর্বেও তাঁর কন্ঠে গান রেকর্ড হয়েছিল কিন্তু আশানুরূপ না হওয়ায় তা বাজারে ছাড়া হয়নি। কমল দাশগুপ্ত যূথিকা রায়ের কন্ঠসম্পদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা না করে তার জন্য প্রণব রায়কে দিয়ে দুটি নতুন ধরনের গান লিখিয়ে সুর দিলেন। গানগুলো রেকর্ড হলো। একটি রেকর্ড ছাড়া বাকী সব বাজারেও গেল। আমি ভোরের যূথিকা এবং সাঁঝের তারকা আমি, এই দুটি গান গেয়েছিলেন নবাগতা যূথিকা রায়। তেমন ভাল হয়নি এই অজুহাতে রেকর্ডটি তখন প্রকাশ হলো না, অবশ্যি দু' মাস পরে রেকর্ডটি বাজারজাত হয় এবং ক্রমশঃ সে রেকর্ড বেস্ট সেলারে গিয়ে দাঁড়ায়।

বাংলা এবং হিন্দী গানের প্রায় সব বিভাগেই তিনি কাজ করেছেন, হিন্দীতে গীত ও ভজন রচনা করেছেন। উর্দুও তিনি লিখতে, পড়তে ও বলতে পারতেন। যূথিকা রায়ের কন্ঠে গীত তুলসী মীরা, সুরদাস কবীর তাঁরই রচনা। দ্বৈতকন্ঠে শ্রীমতী যূথিকা রায় এবং নিজে উর্দুতে নাত গেয়েছেন অপূর্ব কন্ঠে। সবাই উচ্চ প্রশংসা করেছে এই নাত শুনে।

ঠুমরী সৃষ্টিতেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ঠুমরীর বিখ্যাত ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর ঘরানা এমন নিপুণভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে ঠুমরীতে তা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পিলু রাগের ঠুমরী: যদি ফিরে দেখা হয় সহসা: শুনলে মনে হবে জমিরউদ্দীন খাঁর ঘরানা কি অপূর্বভাবে এসেছে তাঁর-- কাজে। মানদাসুন্দরী দাসী গেয়েছেন এই ঠুমরীটি। অনেক সঙ্গীত সমালোচক ও সঙ্গীত রসিকদের মতে, যদি ফিরে দেখা হয় সহসা, বাংলা সঙ্গীতের ভুবনে একটি অতি উৎকৃষ্ট কাজ। এই ঠুমরীর জন্যই অনাগত ভবিষ্যৎ শ্রী দাশগুপ্তকে স্মরণ করবে। সঙ্গীত বিশারদ শ্রী ভীষ্মদেব

চট্টোপাধ্যায় এই ঠুমরীটির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন: কমলবাবু আপনি এমন একটি গান করিয়েছেন যা হিন্দী গানের আসরে বসে শুধু গাওয়া যায় তাই নয়, বাঙালীর রসবোধেরও পরিচয় দেওয়া যায়।

শুদ্ধ রাগ বা রাগাশ্রয়ী গানে কমল দাশগুপ্তের জুড়ি ছিল না। মনে হয় রাগের মধ্যে তিনি যেসব বেশী পছন্দ করতেন তার মধ্যে ভৈরবী অন্যতম। অবশ্যি বাংলার ষড়ঋতু আকাশ বাতাস বনরাজী নদী খাল প্রান্তর সবুজ শস্যের ক্ষেতে যে রূপ সৌন্দর্য অকাতরে ছড়িয়ে আছে আর এ অঞ্চলের মানুষের যে বিবাগী বাউল মন, এ দেশের মানুষের হৃদয়ের যে অন্তর্নিহিত ভাব তা ভৈরবীতেই যেন বেশী প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন ভৈরবী অনুরাগী। বহু গানে, বহু কাব্য সঙ্গীতে তিনি ভৈরবীকে বেঁধেছেন। বিদায়ের যে বিয়োগ ব্যথা, এক ফোঁটা চোখের পানিতে যে অপার আনন্দ মিশে থাকে, মিষ্টি ঠোঁটে মিলিয়ে যাওয়া হাসির সুবর্ণ রেখায় যে কি সর্বনাশা বিনোদনের ইঙ্গিত, প্রিয়ার শেষকথার পরেই যে আসল কথার শুরু কমল দাশগুপ্ত এসবের অন্তর্নিহিত ভাব ভৈরবীতে যত বেশী শিল্পাশ্রয়ী করে প্রকাশ করেছেন, অনেকেই তেমনটি পারেননি। ভৈরবীতে তাঁর অনেক গান---কয়েক শ'। এগুলোর মধ্যে দু' চারটির পরিচয়:

জানি, জানি, একদিন ভালবেসেছিলে মোরে···
বনের কুসুম ছিল বনশাখাতে···
মোর না মিটিতে আশা ভাঙ্গিল খেলা···
আমি ভোরেরও যূথিকা···
যে ফুল আমারে দাও···
যেথা গান থেমে যায়···
নিও না গো অপরাধ···
মোর হাতে ছিল বাঁশি···
তুলসী, মীরা, সুর, কবীর···
দাও গো বিদায়···
ঘ্যড়ি এক ন্যা সুহাবে পিয়া···

বেদনাবিধুর ভীমপলশ্রীতেও তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। নিঃসঙ্গ বিরহী এই সুরে কমল দাশ নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন সমভাবেই। যোগ্য গানের পরিচয় হলো:

বনের তাপস কুমারী আমি গো···
জানি জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না সাধ···
বঁধূ আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনে রাধিকার আঁখিজলে···
তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন···
কেন আগের মত কাছে এসে···
তোমার জীবন হতে তুমি যে বিদায় দিয়েছ আমায় ··
শোনগো সোনার মেয়ে···

বাংলা গানে অভিনব ধারা সৃষ্টি করতে গিয়ে কমল দাসগুপ্ত ছন্দের দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে ছন্দের রূপকার হিসাবে তাঁর মৌলিক প্রতিভার বিকাশ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। বিভিন্ন প্রকার গানে তাঁর ছন্দপ্রয়োগ অপূর্ব এবং অভিনব। তাঁর এই দিকটি গবেষণার অপেক্ষা রাখে। তাঁর সুরারোপিত চার পাঁচ শ' গান প্রতিটি ছন্দের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট। গানের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন অপরূপ তাল বৈচিত্র্য এনে তাকে শ্রুতিমধুর করেছেন বিস্ময়কর ছন্দ পরিকল্পনায়। তাঁর বিখ্যাত ও বহু আলোচিত ছন্দোময় গান গুলোর মধ্যে ঃ

যদি ভালো না লাগে তো দিওনা মন···

(যোগাযোগ ছবিতে এ গান শুনে ইংরেজী পত্রিকার এক সমালোচক দর্শকদের তুমুল উচ্ছ্বাসের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছিলেন.....and the whole house hummed with the tune of---you don't like me don't give your heart.)

মোর অনেক দিনের আশা···
পিউ পিউ গায় পাপিয়া···
ন্যয়ন্য ন মেরে···
তুমি যদি আসিতে প্রিয়···
কোন সুরে জাগে বনান্তে পাপিয়া···
কে সেই সুন্দর কে···
আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনে রাধিকার আঁখিজলে···
আমি চঞ্চল ঝর্ণা ধারা···
আমি বনফুল গো···
(গানটির তাল ও ছন্দ কাওয়ালী)

স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর···
(তাল দাদরা, ছন্দ আদ্ধা ধারায়)
মোর মন চলে যায় সেই দেশে গো···
(তাল দাদরা, ছন্দে ঝুমুরের অপূর্বমিল)
মোসে কাহা না যায়···
(কবীরের বিখ্যাত ভজন—বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন তাল সুরে ও ছন্দে অপূর্ব সঙ্গতি। অস্থায়ীটি আদ্ধা তালে, অন্তরা ও আভোগ অংশ কার্ফাতাল, সঞ্চারী অংশে দাদরা তাল। সঙ্গতে দাদরা অংশে খোল, বাকী অংশে তবলা।)

প্রতিভা যাই স্পর্শ করে তাই সোনা হয়ে যায়। কমল দাশগুপ্ত যেখানেই হাত রেখেছেন সেখানেই সুর আর মাধুর্যের ফল্গুধারা বয়ে গেছে। ত্রিশের দশকের আধুনিক বাংলা গানের জনপ্রিয় ধারাটি প্রবর্তন করতে গিয়ে তিনি সুরের হারমনাইজিং ও ইনস্টিটিউশনালাইজিং করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কখনো মিশ্র ভৈরবী ও ভৈরব-এর ব্যবহার, দাদরার আদলে, নায়কী কানাড়া ও কাফির ছোঁয়ায়, অস্থায়ী কেদারার ছাপ, কালেংড়া বা ভেঁরোর স্পর্শ, কোন অস্থায়ীতে বাগেশ্রীর ছাপ, আবার কখনো সংজ্ঞাহীন সুর বৈচিত্র্যে পূর্ণ করে গান রচনা করতেন শ্রী দাশগুপ্ত। কমল দাশগুপ্তের গান শ্রোতার মনে এমন এক আবেশের সৃষ্টি করত যে তা তাঁকে নিত্য ভুবন থেকে শিবজ্ঞান ও রূপজ্ঞানের এক ধূসর জগতে নিয়ে যেত। কমল দাশগুপ্তের গানে মোহিনী শক্তি আছে, যাদু আছে, অলৌকিক বিকিরণ শক্তি আছে। তাঁর গান উপলব্ধি আর অনুভূতির নিঃসীম জগৎ সৃষ্টির সহায়ক।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী শুভালক্ষ্মীর কন্ঠে যখন কমল দাশগুপ্তের বিখ্যাত ভজন 'মৈ নিরগুণিয়া গুণ নাহী' যখন গীত হতো তখন শ্রোতা বুঝতে ব্যর্থ হতেন একি ভজন না গজল। অথচ সুরের এমন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি যে, হৃদয়মন শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে এবং পুলকে ভরে উঠে সুরস্রষ্টার প্রতি। শ্রীমতি বসন্ত কোকিলমের কন্ঠে যখন কমল বাবুর ভজনগুলো গীত হতো তখন শ্রোতৃ হৃদয় ভেবে পেত না এ কোন নয়ী মীরা।

কমল দাসগুপ্তের সুরারোপিত বাংলা গান তপন কুমার (তালাত মামুদ) এবং শান্তা আপ্তে সহজে সুরেলা কন্ঠে গাইতে পেরেছেন। হেমন্ত কুমারের

কন্ঠে তাঁর সুরারোপিত হিন্দি গান: ও প্রীত নেভানেওয়ালী এবং কিতনে দুখ ভুলায়া তুমনে গীতগুলো শ্রোতার মনে আশ্চর্যরকম সম্মোহনী ভুবন সৃষ্টি করেছে। কমল দাশগুপ্তের কিছু গান আছে যা সব যুগের সব কালের মানুষের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে, দাগ কাটবে, এ ক'টি গানকে তো আমরা ভুলতেই পারি না:

জানি জানি গো মোর শূন্য হৃদয় দেবে ভরে···
আঁখিজল আঁখিজল কেন এলে···
বিরহে তোমারে পাই···
তব গানের সুরের ভাষা···
আমি নীরবে তোমায় দেখিতে এসেছি···
আমি বনফুল গো···
ওরে আমার গান···
ওরে নীল যমুনার জল···
কত গান ছিল গাহিবার···
কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও···
কভু ভাবি জানি তব মন···
গত জনমের গত কথা···
চরণ ফেলিও ধীরে···
তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো···
তুমি এসেছিলে জীবনে আমার···
তুমি দুঃখ দিতে ভালবাস···
তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতেরই পরে···
দিনের সকল কাজের মাঝে···
দুটি পাখী দুটি তীরে···
নিও না গো অপরাধ···
বল প্রিয়তম বল···
বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে···
ভুলি নাই ভুলি নাই···
মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে···
মেনেছি গো আজ হার মেনেছি···

মোর আধেক জীবন গেল ভালবেসে···
যদি কোন দিন ফিরে আস প্রিয়···
শ্যামলের প্রেম যেন নয়নের জল···
সবার দেবতা তুমি আমার প্রিয়···

(বলা বাহুল্য, এটি একটি আংশিক তালিকা)

ইসলামী সঙ্গীতেও কমল দাশগুপ্তের অবদান অসামান্য। বাংলা গানে তিনি অভিনব পদ্ধতিতে গজল প্রবিষ্ট করিয়েছেন। গজলের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন। বাংলা গানে কাজী নজরুল ইসলাম ও অতুলপ্রসাদ গজলের প্রবর্তন করেন। তবে কমল দাশগুপ্ত যে গজল বাংলা গানে এনেছেন তা বিশেজ্ঞদের মতে উর্দু গজলের প্রতিচ্ছায়া তিনি সে গজলকে স্বীয় সুরপরিকল্পনায় নবরূপ দিয়েছেন। কমল দাশগুপ্ত গজলে ব্যাপক বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা এনেছেন। শুধু বাংলা গানে নয় বহু গজলের সুর নতুন করে হিন্দীতে বেঁধেছেন। ভজনে ও ভক্তিমূলক গানে তিনি গজলের শেয়র প্রয়োগ করে সে গানের আবেদনের সীমা বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছেন। ইতিপূর্বে ভৈরবীতে দুটি বাংলা গজলের উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি গজলের উল্লেখ করছি:

মন নিয়ে প্রিয়···
মাটির এ খেলাঘরে···
(এই গানটির সুরকার হিসাবে সুবল দাশগুপ্তের নাম প্রচারিত থাকলেও এর প্রকৃত সুরকার কমল দাশগুপ্ত)।
আধো আধো বোল···
আশা দিয়ে যে চলে যায়···
(উর্দু—ইস্ক কা রোগ মোল কর)
চম্পা পারুল যুথী···
পথ ভুলে কবে এসেছিলে···
ফিরিয়া ডেকো না মহুয়া বনের পাখী···
বিদায় বেলার গানখানি প্রিয় ভুলনা···
প্রিয় ঘরে চলে যায় বিদায় বিধুর প্রাতে···
মধুরাতি সারা হলে···
ইধ্যর আ রাহে হ্যঁয়···

হিথ্রকী কি তারিকিয়োঁ মে···
ত্যাসবীর তৈরী দিন মেরা···
আমার যাবার সময় হোল···
(নজরুল গজল গীতি)

কমল দাশগুপ্তের সৃষ্ট কিছু সংখ্যক। কাওয়ালী ধরনের কিছু ভজনও আছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

ন্যইয়াপে হো যা স্যওয়াব···
মোরে কৃপা করো গিরিধারী···
ক্যন্যহ্যইয়া ত্যন-ম্যন লুটানে চলী···
গাহ কৃষ্ণনাম অবিরাম···

গ্রামোফন কোম্পানীর টুইন রেকর্ডে শিল্পীই অধিকাংশ পেশাদার ছিলেন। কমল দাশগুপ্ত প্রত্যেক শিল্পীর কন্ঠ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে এবং প্রত্যেকের কন্ঠের উপযোগী করে সুর সংযোজন করতেন। তিনি এসব ক্ষেত্রে দাদরী, ঠুমরী এবং গজলকেই বেশী প্রাধান্য দিতেন। অপেশাদার ও সৌখিন শিল্পীদের জন্য সুর রচনা করতে গিয়ে তিনি একটি জিনিস খুঁজে বের করলেন। কমল দাশগুপ্ত নিজে গাইতেন এবং সুর সংযোজনা করতেন। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল যে, সুরারোপে তিনি অধিকতর নৈপুণ্য ও সাফল্য অর্জন করছেন। গীতিকার হিসাবে কাজী নজরুল ইসলাম ও প্রণব রায় তখন গ্রামোফন কোম্পানীর আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত জ্বল জ্বল করছেন। এই ত্রয়ী সম্মিলন হিজ মাস্টার্স কোম্পানীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত এক রসঘন অধ্যায়। এঁরা তিনজনই গানের ভাবরূপ বা আত্মা। শিল্পীর কন্ঠ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কথা ও সুর রচনা করে এই ত্রয়ী শক্তি এক যুগ ব্যাপী বাংলা গানে আনন্দ ধারার প্রবর্তন করেন। ব্যক্তি বিশেষকে নিয়েও তিনি যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। যেমন, যূথিকা রায়ের কন্ঠ নিয়ে সবচেয়ে বেশী গবেষণা করেছেন। শিল্পী যূথিকা রায় গীত রেকর্ডের সংখ্যা দেড়শরও বেশী। এই দেড়শ রেকর্ডের দু'চারটি ছাড়া সব রেকর্ডের সুরকার কমল দাশগুপ্ত।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য চমৎকার ভাষায় এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ ধারাবাহিকভাবে এই রেকর্ডগুলো শুনলে শুধুমাত্র বাংলার একজন বিশিষ্ট শিল্পীর ক্রমবিকাশকে অনুধাবন করা যাবে

কমল দাশগুপ্তের সুরে মায়া আছে, যাদু আছে;
তাঁর গানে এমন এক আবেশ সঞ্চারী সুরলোক
আছে যার গুণে শ্রোতা নিত্যভুবন থেকে নির্মল
রূপময় এক মুগ্ধ জগতে উপনীত হয়

তাই নয়, বাংলার একজন সঙ্গীত স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ কীর্তিকেও তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে--যার মধ্যে সঙ্গীতের একটি সৃজনশীল কাল বিধৃত হয়ে আছে। শিল্পী যূথিকা রায় যখন তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনে পূর্ণ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং কমল দাশগুপ্তের সুরকার জীবনে এক নতুন দিকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সেই সময়েই কমলদাশগুপ্তের সঙ্গে গ্রামোফন কোম্পানীর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। যে মহতী সম্ভাবনা উন্মুখ হয়েছিল তা আর বিকশিত হল না।

বলা যায়, শ্রীমতি যূথিকা রায় ছিলেন কমল দাশগুপ্তের সাঙ্গীতিক কল্পনা রাজ্যের পূর্ণরূপ ভাবমূর্তি। তাঁর যা সাধনা ছিল সবকিছুর বিনিময়ে তিনি যূথিকা রায়কে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। গুরু শিষ্যার এই ঐতিহাসিক নিবিড় সম্পর্কের প্রতিদানও শ্রীমতি যূথিকা রায় দিয়েছেন সমান মূল্যে--সারা জীবন কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত গান ছাড়া তিনি গান নি।

বাংলা গানে গণসঙ্গীত বলে যে অংশটি আমাদের চমৎকৃত, আন্দোলিত ও উত্তপ্ত করে তাতেও কমল দাশগুপ্তের অবদান কম নয়। ১৯৩৮ সালে টুইন রেকর্ডে তিনি অসিতবরণ, গিরীণ চক্রবর্তী এবং সুবল দাশগুপ্তকে দিয়ে কাঠুরিয়ার গান এবং পাল্কীর গান গাইয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত হারা মরু নদী গানটি প্রেমের গান নয়, সাধারণ মানুষ আকুতি কথা ও সুরে তাতে সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে বেশ কয়েক বছর বাংলার কাব্য সঙ্গীত কাননে কমল দাশগুপ্ত কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রম ধর্মী ফুল ফুটিয়েছেন। এ ফুল গণ বিক্ষোভের, এ ফুল বিদ্রোহের এবং প্রতিবাদের। কবি মোহিনী চৌধুরী রচিত কিছু গান নিয়ে তাঁর এই প্রচেষ্টা। এইসব গানেই রোমান্টিক রিভলিউশানের এক অভিনব স্বাদ পাওয়া যায়। এ ধারার ক'টি বিখ্যাত গান:

পৃথিবী আমারে চায় রেখ না বেঁধে আমায় ...
জেগে আছি একা জেগে আছি কারাগারে ...
আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড় ...
তখনো ভাঙ্গেনি প্রেমের স্বপনখানি ...
যাদের জীবনভরা শুধু আঁখিজল ...
ভেঙেছে হাল, ছিঁড়েছে পাল ...

নাই অবসর-বাজায়োনা বীণাখানি ...

শতেক বরষ পরে ...

এইসব গানের প্রতিটিই বাংলার আকাশে বাতাসে ব্যাপকভাবে অনুরণিত হয়েছে। গানে আগ্রহী বাঙ্গলী মাত্রই এসব গানের দু চার কলি জানেন, অবসরে গুন গুন করেন। তার মধ্যে আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড় ও শতেক বরষ পরে এই গান দুখানির আবেদন শাশ্বত।

সুর বৈশিষ্ট্য

কমল দাশগুপ্তের সুরের প্রধান ও উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য কি, কেন তাঁর গান জনগণমনবন্দিত হয়েছে, কি কারণে তিনি বিপুলভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁর গানের আশ্রয় কি? কেন তিনি বাংলা উর্দু হিন্দী তামিল ভাষায় রচিত গানে সমানভাবে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন, কি করে তিনি হাজার হাজার গানে বিচিত্র সুর আরোপ করতে পেরেছিলেন।

এতগুলো প্রশ্নের বিস্তৃত জবাব দান সম্ভব নয়। এ জন্য গবেষণার প্রয়োজন। অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়ঃ

কমল দাশগুপ্তের সুর পরিচ্ছন্ন, সুমিষ্ট ও মাধুর্যময়। তাঁর গান হৃদয়, মনকে চমৎকৃত করে, আলোড়িত করে। মোহময় আবেশের সৃষ্টি করে তাঁর সুর; শ্রোতা বিভোর হয় তাঁর গানে। এক কথায় কমল দাশগুপ্তের গান ভাল লাগে। তাঁর সুরের উল্লেখযোগ্য উপাদানের মধ্যে মিশ্রণ একটি। রাগ-ভিত্তিক রাগাশ্রয়ী বহু গান আছে যেখানে স্থান পেয়েছে অভিনব মিশ্রণ। তাঁর সুরের ভাবরূপ, সুরপরিকল্পনা, গানের দেহ গঠন, স্বরবিন্যাস, স্বরসঙ্গতি, রাগের মিশ্রণ পদ্ধতি সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ এবং লীলাময়।

শিল্পের অন্যতম বড়কথা পরিমিতি, পরিমাণবোধ। শিল্পীকে জানতে হয় কোথায় শুরু করতে হবে, কোথায় গিয়ে থামতে হবে। এই বোধ কমল-দাশগুপ্তের ছিল পুরোপুরি। প্রতিটি গানের ভাবরূপ সম্পর্কে তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল গায়কগায়িকাদের কন্ঠ বৈশিষ্ট্যের ওপর। তাঁর প্রচণ্ড জীবনীশক্তি, চিন্তাশীলতা, কল্পনাশক্তি এবং রাগ রাগিণী সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান সুর সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। রাগসঙ্গীতে দক্ষতার সীমা শীর্ষে ছিল বলেই অকাতরে তিনি সুরের বিচিত্র গতিপথ ও মোহনা

নিয়ে খেলা করতে পেরেছেন। এভাবেই তাঁর সঙ্গীত জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করা যায়।

কমল দাশগুপ্ত মৌলিক এবং সৃজনশীল সুরস্রষ্টা। তিনি কঠিনের সীমা পরিসীমা সঠিক মত জানতেন বলেই অতি সহজে সেই কঠিনকে ব্যবহার করতে পারতেন। কমল দাসগুপ্তের গান কি তবে সহজ? হেমচন্দ্র সোম জবাব দিয়েছেন: কমলের সুর শুনে যত সোজা মনে হয় আসলে তা নয়। শ্রী মতি কানন দেবীর 'সবারে আমি নমি' গ্রন্থ থেকে বলি: কমলবাবু তখনকার দিনে--শুধু তখনকার দিনেরই বা বলি কেন, সর্বযুগেই বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের এক শীর্ষস্থানীয় সুরকাররূপেই সম্মানিত হবার মতই সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। সুরকার হিসাবে বিভিন্নভাবের ও ছন্দের গানে তাঁর অফুরান বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষমতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

কমল দাশগুপ্ত বাংলা গানে এক অভিনব জনপ্রিয় ধারার সৃষ্টি করেছেন। সুর বৈচিত্র্যে তার সৃষ্টিকৌশলের ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন সক্রিয় ছিল। তিনি সাধারণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য যেমন গান সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি অনাগত কালে বেঁচে থেকে ঐতিহাসিক মূল্য অর্জন করবে এমন বহু গান রচনা করেছেন। যেমন হাল্কা হিন্দী গান 'চুপকে চুপকে বোল ময়না' তিনি রচনা করেছেন (গানটি লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়েছিল) ঠিক তেমনি 'যদি ফিরে দেখা হয় সহসা'-র মত ঠুমরী সৃষ্টি করেও কালজয়ী হয়েছেন। শিল্পে পুনরাবৃত্তি (**repetition of same words thoughts, moods and ideas**) এবং উপর্যুপরি পরিবর্তনশীলতা দোষের; এতে সৃষ্ট বস্তুর সার্বিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। শ্রী দাশগুপ্ত এইসব দোষ থেকে প্রায় মুক্ত ছিলেন। রামপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ চিনতে যেমন কষ্ট হয় না, তেমনি কমল দাশগুপ্তের সুরকেও সহজেই চেনা যায়। সুরকার কমল দাশগুপ্তের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, সুরে তিনি বাংলা গানে বহু কিছুর মিশ্রণ ঘটিয়ে পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছেন। তাঁর সুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার তা ভাল লাগে এবং সবার তা ভাল লাগবে। শ্রীজগৎ ঘটক আরো সুন্দরভাবে তাঁর সুর বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করেছেন: তার গানের সুরে প্রায় ছেদ দেখা যেত না। সুরকে গানের ভাষায় ও ছোট ছোট তালের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সচল করে রাখতেন। আধুনিক গানের সুরের একটা বিশেষ ধরন তাঁর গানের মধ্যে পাওয়া যায়, এই ধরন বা স্টাইল তঁর নিজস্ব।

কমল দাশগুপ্তের জীবনে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক সুদীর্ঘ অধ্যায়। সুরকার ও গায়ক কমল দাশগুপ্তের অন্যতম পরিচয় তিনি নজরুল গীতির বিশেষজ্ঞ এবং সুরকার। কবির বহু বিখ্যাত ও জনপ্রিয় গানের সুরকার তিনি। তাঁর পত্নী নজরুলগীতির বিখ্যাত গায়িকা ফিরোজা বেগমের কন্ঠে গীত ও রেকর্ডকৃত বহু গানের স্রষ্টা শ্রী দাশগুপ্ত। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৫ এগারোটি বছর তিনি হিজ মাস্টার ভয়েসে কবির সাথে কাজ করেছেন। বিদ্রোহী কবির সাথে তাঁর একাত্মভাব শুধু বাংলা গানের ইতিহাসে নয়, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কমল দাশগুপ্ত, নজরুল ইসলাম ও প্রণব রায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাংলা কাব্য সঙ্গীতের অগ্রগতিতে যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে তা নিঃসন্দেহে গবেষণার বস্তু।

বিদ্রোহী কবির সঙ্গে বহু ব্যস্ত সকাল, কর্মক্লান্ত মধ্যাহ্ন, জমজমাট সন্ধ্যা, বিভোল রাত কেটেছে কমল দাসগুপ্তের। এই এগার বার বছরের সান্নিধ্য, নৈকট্য ও বন্ধুত্ব কবিকে জানার জন্যে সুরকার কমলকে বিরাট সাহায্য করেছে। একটা ঐতিহাসিক আত্মীকরণ ঘটেছিল এই দুই যুগপুরুষের মধ্যে। দুজনে এক পবিত্র বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সুরের জগতে। একজন অন্যজনের মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পেরেছিলেন বলেই কমলদাশগুপ্ত শত শত নজরুল গীতির চমৎকার সুর করতে পেরেছিলেন—পেরেছিলেন নজরুল রচিত গানের দেহ এমন বিশিষ্ট সুরে সজ্জিত করতে যা পরবর্তী ও অনাগত কালে নজরুলগীতি ধারা নামে এখন এক ইনস্টিটিউশনে পরিণত।

বিদ্রোহী কবির সাথে কমলদাশগুপ্তের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানীর অফিসে। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি : কবি প্রণব রায়ের মুখে কাজী নজরুল ইসলামের নাম শুনে আবার নতুন করে বিপদে পড়লাম। আমি নাম দিয়েছিলাম স্বদেশীয়ালা, বড় হয়ে শুনেছিলাম কবি নজরুল ইসলাম। বড় ভাই (বিমলদাশগুপ্ত) বলেন, কাজী সাহেব এবং শেষে হল কাজী নজরুল ইসলাম। আমার অবস্থা দেখে প্রণব রায় আমার বোন সুধীরা দাশগুপ্তার (সেনগুপ্তা) গীত গানের প্রথম লাইনটি আনো সাকী শিরাজী শুনিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনিই কবি নজরুল ইসলাম।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে টুইন এবং হিজ মাস্টার্স সংযুক্তিকরণের ফলে গ্রামোফন কোম্পানীতে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যা শ্রী দাশগুপ্তের জন্য ছিল প্রতিকূল। এই প্রতিকূল অবস্থায় কমল দাশগুপ্ত যাদের কাছে সহযোগিতা পান—বিদ্রোহী কবি তাঁদের অন্যতম।

প্রথম আলাপের পর কমল দাশগুপ্তের প্রতিক্রিয়া ছিল নজরুল ইসলাম সম্পর্কে এরূপ: আমার সুর তাঁর কাছে ভাল লেগেছে? সত্যিই কি তিনি শুনেছেন? তিনিও সুরকার তবু কেমন করে আমার প্রশংসা করলেন যখন বড়দলের আরো দুজন সুরকার আমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন? এই প্রথম তার উদারতার পরিচয় পেলাম এবং তার কাছে যাব, একসঙ্গে কাজ করব, তাঁর লেখা গানে সুর দিতে পারব ইত্যাদি ভেবে আনন্দের আর সীমা রইল না।

এইচ. এম. ভি'তে সুরকার যন্ত্রী এবং ব্যবস্থাপনার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন কমল দাশগুপ্তের বড় ভাই বিমল দাশগুপ্তের বন্ধু। সেই সুবাদে কমলদাশ-গুপ্তের গুরুস্থানীয়। এতে অনেক সময় নীরবে অনেক গঞ্জনা সইতে হতো। সুরকার দাসগুপ্তের ভাষাতেই বলি: আমার বেশ মনে আছে কাজীদা নিজেও ঘরের অভাবে বহুদিন দোতালার (হিন্দী বিভাগ) একটি ঘর খুলিয়ে নিয়ে সেই ঘরে বসে বসে কাজ করছেন। আমি আর থাকতে না পেরে কাজীদার শরণাপন্ন হলাম। আশ্চর্য! তিনি আমার কথা শুনেই বললেন—আমাকে আগে বলিসনি কেন, আমি বড় বাবুকে (আমাদের কর্তা) বলে সব ঠিক করে দিতাম। আমি ভয়ে বলিনি কাজীদা, ওনারা যদি কিছু মনে করেন।

রেকর্ড কোম্পানীতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু অসুবিধা থাকত। দুচারটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এসে যেত। রেকর্ডের ডিলাররা অনেক সময় নানা ঝামেলা করতেন। রেকর্ডের ভালমন্দ নির্ভর করতো তাদের অভিরুচির উপর। নিম্নোক্ত অংশটি থেকে কমল-নজরুল সম্পর্কের গভীরতা পরিমাপ করা যাবে।

কাজীদা আমাকে ডেকে বললেন, কমল খুব সাবধান। ডিলাররা (দোকান-দাররা) কিন্তু যূথিকার রেকর্ডটি বাতিল করে দিতে পারে; তুই এক্ষুণি বড় বাবুকে বলে রাখ যে, ডিলাররা বাতিল করলেও তিনি যেন নিজের ক্ষমতায় রেকর্ডটি বাজারে চালু করেন। আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম, কারণ রেকর্ড পাশ করা বা বাতিল করা আমাদের কাজ; ডিলাররা এর মধ্যে আসে কি করে?

এভাবে তিনি ও নজরুল ইসলাম এক নিগূঢ় আত্মীয়তায় সমর্পিত হয়েছিলেন। মেলামেশা যে পর্যায়ে উন্নীত হলে সৃষ্টি হয় প্রাণবন্ত, সচ্ছন্দগতি ও পরিপূর্ণতা, তাদের তাই হয়েছিল।

কমল দাশগুপ্তের জবানীতে কিছু কথা :

এখানে আমি কাজীদার ও আমার প্রতিদিনের একটি কর্মসূচী দিলাম যা থেকে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হত আমাদের দুজনের। সকাল ৮টায় রিহার্সাল রুমে এসেই কাজীদা প্রথম শিল্পীর জন্য গান রচনা করতেন বা সুর দিতেন। আমিও হয় সুর দিতাম না হয় ভজনের বই থেকে গান বেছে নিতাম, ইত্যাদি। ৯টার মধ্যেই প্রথম শিল্পীরা এসে যার যার শিক্ষকের ঘরে চলে যেতেন এবং এক ঘন্টার মধ্যেই তারা চলে যেতেন, আসতেন দ্বিতীয় দলের শিল্পীরা এবং এইভাবে বেলা তিনটা পর্যন্ত আমাদের রিহার্সাল চলতো। এই সময়ের মধ্যে আমরা দম ফেলতে পারতাম না। তিনটায় রিহার্সাল শেষ করেই শুরু হত পরের দিনের শিল্পীদের গান তৈরী করা এবং সে কাজ শেষ হতো সন্ধ্যা ছয়টায়। এই তিন ঘন্টা শুধু আমরা দুজন থাকতাম, কখনও আমি তার ঘরে যেতাম আবার কখনো ওনি আমার ঘরে আসতেন। এই তিন ঘন্টা আমরা দুজন দুজনকে একান্ত আপনার করে পেতাম, এবং কাজের কথা, ঘরের ও বাইরের কথা,—ভবিষ্যতের গানের ও শিল্পীদের কথা অর্থাৎ সব রকমের কথা হতো।....কাজীদা সন্ধ্যা ছয়টায় চলে যেতেন কিন্তু আমার কাজ ছিল ওস্তাদজীকে (জমিরুদ্দীন খাঁ) সাহায্য করা (হিন্দী-উর্দু বিভাগের কাজ) এবং রাত ১০টায় রিহার্সাল শেষ হলে নিজের গান শেখা (উচচাঙ্গ সঙ্গীত) এবং রাত ১২টা নাগাদ ওস্তাদজীকে তাঁর বাসায় পৌঁছিয়ে (রাজাবাজার) বাড়ি ফিরে যাওয়া।.....আমি ও কাজীদা বছরের পর বছর দিনের বেলা কোনও খাবার না খেয়ে কাটিয়েছি। বাড়ি থেকে খাবার আনিয়েও দেখেছি সে খাবার তেমনি পড়ে আছে; খাবার সময় পাইনি।

বাংলা গানের বিভিন্ন দিক নিয়ে কমলদাশগুপ্ত কবির সাথে বিচার বিশ্লেষণ করতেন। বাংলা গানের ছন্দ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হতো। তাঁর ভাষাতেই বলি : বাংলা গানের ছন্দ সম্পর্কে আমি একদিন কাজীদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এক শ' এর মধ্যে ৮০টি গান কেন ত্রিমাত্রিক ছন্দে লেখা হয় অর্থাৎ ১২৩/১২৩/১২৩/১২৩/তিন মাত্রায় একটি করে ভাগ

হয় এবং '১' এর উপর প্রধান ঝোঁকগুলো পড়ে। কাজীদা অস্বীকার করলেন কিন্তু আমি তখনই তাঁরই লেখা কতগুলো গান শুনিয়ে দিলাম এবং রবীন্দ্রনাথও যে বাদ যাননি তাও প্রমাণ করে দিলাম। কাজীদা নিজেই অবাক হয়ে গেলেন এবং কারণ বলতে পারলেন না। মজার কথা হল এই যে, হিন্দী সাহিত্যে চতুর্মাত্রিক ছন্দ খুব বেশী আর ত্রিমাত্রিক ছন্দ খুবই কম। কাজীদা আমাকে বললেন, তুই এত খবরাখবর রাখিস আর আমরা কবি হয়েও এতদিন এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করিনি। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন—দেখ কমল আমার কাছে একটি সংস্কৃত শ্লোকের বই আছে, শ্লোকগুলো নতুন নতুন ছন্দে লেখা। তার ওপর যদি বাংলা গান লেখা যায় তবে কেমন হয়? আমি জবাব দিলাম, ভালো হবে। আমার মনে হয় সেই দিন থেকেই তিনি সে কাজ শুরু করেছিলেন।

ইতিমধ্যে গীতিকার প্রণব রায় হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় বিদ্রোহী কবির ওপর শ্রীগুপ্তের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। কাজী সাহেবও কমল দাশগুপ্তের গানের চাহিদা মিটিয়ে যেতে থাকলেন। এই সময় দুজনে দৈনিক প্রায় তিন চার ঘন্টা একত্রে কাজ করেছেন। কমল-দাশগুপ্তের অনুরোধে কবি নজরুল উর্দু গজল ও কাওয়ালীর সুরে বহু গান রচনা করে দিয়েছেন। কবি, তাঁর জন্য বেশ কিছু সংখ্যক ইসলামী গানও রচনা করেন। সুরকার ও গীতিকার একসঙ্গে না বসলে গানের সুর ঠিক করা যায় না। তাই রিহার্সলের পর বেলা তিনটা পর্যন্ত প্রত্যহ দুজনে একান্ত নিরিবিলিতে এই সুখময় দায়িত্ব পালন করতেন।

সুরারোপের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়েও এ দুজনের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হতো। শ্রী গুপ্তের এক প্রশ্নের জবাবে বিদ্রোহী বলেছিলেন, গজল গানের সুর করা খুবই সহজ, কারণ তার একটা ছক আছে। যে সুরকার ভাল ভাল গজল শুনেছেন তাঁর পক্ষে সেই সব সুরের সাহায্য নিলেই বাংলা গজল সুর করা সহজ হয়ে যায়। তাছাড়া গজল গানে মাত্র দুটি লাইনের সুর করলেই সম্পূর্ণ গানের সুর হয় এবং সুর সম্পূর্ণ গানটি গাওয়া হয়। বাংলা দাদরা ও ঠুমরী সম্পর্কেও বিদ্রোহী কবি এবং কমল দাশগুপ্তের ধারণা এক ছিল।

একযুগ সময় কমল দাশগুপ্ত বিদ্রোহী কবির ছায়ায় ছিলেন। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে সঙ্গীতের এমন কোন শাখা নেই যা তাঁদের আলোচনায় আসেনি।

বিদ্রোহী কবির গানের এনাটমী সম্পর্কে কমল দাশগুপ্তের পুরোপুরি জ্ঞান ছিল। কবির মনের মানচিত্র গভীর মমতায় তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল বলেই তার শ্রেষ্ঠ গানগুলোতে তিনি সুরারোপ করে সার্থক হয়েছেন। কমল দাশগুপ্তের মতে তার সুরারোপিত নজরুল গীতির সংখ্যা চারশোর কাছাকাছি। তাঁর সুর করা কিছু গান ঃ

আমি চাঁদ নহি অভিশাপ ... ...
আমি যার নূপুরের ছন্দ ... ...
কেন মনবনে মালতী বল্লরী দোলে ... ...।
বল প্রিয়তম বল ... ...
গভীরে নিশীতে ঘুম ভেঙ্গে যায় কে যেন আমারে ডাকে ... ...
ফুটালেনা কেন ভীরু এ মনের কলি ... ...
জানি জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না সাধ ... ...
তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরিগো সকল ফুলের মুখে ... ...
দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই তোমার নামের গান ... ...
আমার ভুবন কান পেতে রয় প্রিয়তম তব লাগিয়া ... ...
দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে জেগে আছে মোর আঁখি ... ...
ফুলে পুছিনু বল ওরে ফুল ... ...
নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান ... ...
রোজ হাসরে আল্লা আমার করোনা বিচার ... ...
সুদূর মক্কা মদীনার পথে আমি রাহী মুসাফির ... ...
বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে ... ...
নাম মহম্মদ বোলরে মন ... ...
যদি রাধা হতে শ্যাম ... ...
আধো আধো বোল ... ...
আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে ... ...

চলচ্চিত্র

কমল দাশগুপ্তের গৌরবময় জীবনের এক বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে রয়েছে চলচ্চিত্র। ছায়াছবির গানে তিনি সুর দিয়েছেন, এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। সেখানেও সাফল্যের বিজয় মুকুট তিনি লাভ করেছেন বহু বার।

১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৬৭ সুদীর্ঘ এই একত্রিশ বছর তিনি চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। ৪০টির বেশী ছবিতে তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে বাংলা, হিন্দী, তামিল ও কনেকটি ইংরেজী প্রামাণ্য চিত্র।

কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত প্রথম ছবি পণ্ডিত মশাই (১৯৩৬), শেষ ছবির নাম বধূবরণ (১৯৬৭)। গরমিল, শেষ-উত্তর, যোগাযোগ, গোবিন্দদাস, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও হিন্দী ছবি মেঘদূতে সঙ্গীত পরিচালনার জন্য চিরদিন তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। একবার বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়াকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার মতে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক কে? বড়ুয়া অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিলেন--কমল দাশগুপ্ত অসাধারণ গুণী। শেষ উত্তর ছায়াছবি প্রসঙ্গে খ্যাতনামা অভিনেত্রী গায়িকা কানন দেবী তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে বলেছেন: শেষ উত্তরের প্রতিটি গান সমান জনপ্রিয় হলেও যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে গানটির সুর কল্পনার আবেগ আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল।

কমল দাশগুপ্ত আমেরিকান ডানকান ব্রাদার্সের কিছু তথ্যমূলক চিত্রেও সঙ্গীত পরিচালনা করেন। গরমিল (১৯৪২) এবং যোগাযোগ (১৯৪৩) ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার জন্য তিনি বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি কর্তৃক পর পর দুবছর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের সম্মান লাভ করেন। যোগাযোগ সঙ্গীত পরিচালনার জন্য ১৯৪৩ সালেই বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘ তাঁকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকরূপে অভিনন্দিত করেন।

তিনি ঢাকাতে ও একটি চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেন। চিত্রটি হলো অমল বসু পরিচালিত, কেন এমন হয়।

কমল দাসগুপ্ত ও ফিরোজা বেগম

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নজরুল সঙ্গীত গায়িকা ও বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ ফিরোজা বেগম এবং কমল দাশগুপ্তের ১৯৫৬ সালের ২৮শে মার্চ বিবাহ হয়। ফিরোজা বেগম ফরিদপুরের খানবাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের কন্যা। পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগে তাদের পরিণয় সম্পন্ন হলেও কন্ঠসঙ্গীতে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী কিশোরী ফিরোজা

ত্রিশের দশকেই এই বরেণ্য সুরকারের সংস্পর্শে আসেন। ফিরোজা বেগম ছিলেন কমল দাশগুপ্তের প্রিয় ছাত্রী। এই সম্ভাবনাময় গায়িকার প্রতিভার ছটা কমল দাশগুপ্ত উপলব্ধি করতে পেরে তাঁকে যত্নের সাথে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন। বিবাহ কালেই কমল দাশগুপ্ত ধর্মান্তরিত হন। তিনি সঙ্গীতবিদ হিসাবে যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন স্বামী হিসাবেও ছিলেন তেমনি। তাঁদের তিনজন পুত্র সন্তান। একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কমল ফিরোজার মধ্যে গুরু শিষ্যার যে এক পবিত্র সশ্রদ্ধ সম্পর্ক ছিল তা তাঁদের দাম্পত্য বন্ধনকে প্রেমময়, সুখী ও সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছে। দাম্পত্য জীবনে সুর ও কন্ঠের এই দুই যাদুকর সঙ্গীতের এমন এক ভুবনে প্রবেশ করেছেন যেখানে সৃষ্টি আর আনন্দ পাশাপাশি বিরাজ করে। দুজন সুর সৃষ্টিতে একে অপরের পরিপূরক—একথা অনস্বীকার্য। নজরুল গীতির বিকাশ ও প্রসারের ইতিহাসে কমল ফিরোজা এক বিরাট অঙ্গন জুড়ে রয়েছেন।

শিক্ষক কমল দাশগুপত

কমল দাশগুপ্ত যেমন ছিলেন জাত শিল্পী ঠিক তেমনি ছিলেন জাত শিক্ষক। সঙ্গীত শিক্ষাদান ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। পরিপূর্ণভাবে নিজে শিক্ষাগ্রহণ এবং সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের তা দান করায় তিনি ছিলেন অকৃপণ। শিক্ষাদানে ফাঁকি দেয়া তিনি ঘৃণা করতেন এবং রীতিনীতি ও নিয়মকানুনের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। এইচ. এম. ভি'তে বড় কি ছোট সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতেন, সমীহ করতেন এবং ভয় পেতেন। সবাই বলতেন, শিল্পী যতই বড় হোক আর যত ছোটই হোক কমল দাশগুপ্তের উপস্থিতিতে সবার বুক কাঁপতো। সঙ্গীত শিক্ষায় এতটুকু অমনোযোগিতা, বা অবহেলা তিনি সহ্য করতেন না। প্রত্যাশিত সুরটি বা বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান না হওয়া পর্যন্ত নিজে যেমন বিশ্রাম নিতেন না, তেমনি ছিল না তাঁর শিক্ষার্থী বা শিল্পীর সহজ পরিত্রাণ।

১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে যে পরিবর্তন সূচিত হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশের ওপর তার একটা মারাত্মক প্রভাব পড়ে। তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরীকে কেন্দ্র করে সঙ্গীতের বিকাশের ধারাটি যে কোন সংস্কৃতিবান, বিবেকবান মানুষকে পীড়িত করতো।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কমল দাশগুপ্ত ঢাকায় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান, বেতার ও টেলিভিশনকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠা সঙ্গীতকে বেশ কিছুদিন গভীরভাবে লক্ষ্য করেন। সঙ্গীত বিকাশের এই করুণ অবস্থা দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। এই সম্পর্কিত তাঁর প্রতিক্রিয়া : আজ পর্যন্ত কোন বাড়ীতে কোন ছেলেমেয়েকে স্বর সাধনা করতে বা গান গাইতে শুনি নি। যে কয়টি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান আছে তারা যে পদ্ধতিতে গান শেখায় তাতে কিছুতেই ভালো শিল্পী তৈরী হতে পরে না। কারণ একই সঙ্গে ২৫/৩০টি ছেলেমেয়ে গান শেখে, তাই কার হচ্ছে বা না হচ্ছে তা দেখার সময় হয় না। এই শিক্ষায় সমবেত সঙ্গীত শেখা যেতে পারে কিন্তু একক সঙ্গীত শেখা হয় না। কিছু শিখে বা না শিখেই ছেলে মেয়েদের একটা প্রবণতা দেখা যায় বেতার ও টেলিভিশনের দিকে ঝোঁক। এতে বলতে গেলে সঙ্গীত শিক্ষা পণ্ড হয়ে যায়। তবুও এইভাবে কিছু গান শেখার পরেই ছেলেমেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য হয় রেডিও বা টেলিভিশনে গান গাওয়া। অভিভাবকরাও ভাবেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা এতদিন গান শিখছে এবং খাতায় এত গান রয়েছে সুতরাং রেডিওতে তারা কেন গাইবে না ?

আদর্শ শিক্ষক কমল দাশগুপ্ত জানতেন যে সঙ্গীত শিক্ষাই হোক আর অন্য কোন শাখাতেই হোক, শিক্ষা হওয়া উচিত পূর্ণাঙ্গ, বিশুদ্ধ এবং শ্রমলব্ধ। শিক্ষা অর্জন সহজসাধ্য নয়। সচেতন সঙ্গীত গুরু এই অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন : শুনেছি রেডিওতে নাকি শিল্পীর তালিকা এত বড় হয়ে গেছে যে কর্তারা আর সামলাতে পারছেন না। তাঁদের খুব ভাল করে জানা দরকার যে, এত সহজে রেডিও প্রোগ্রাম পেলে এবং টাকা উপার্জন করলে ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, আর তারা গান শিখতে চাইবে না। শুধু কতগুলো গান জোগাড় করতে চেষ্টা করবে যাতে রেডিওর প্রোগ্রাম বজায় থাকে। রেকর্ড, স্বরলিপি ও টেপ রেকর্ডার হবে তাদের শেখার মাধ্যম। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একথা জোর গলায় বলতে পারি যে রেডিওতে ছেলেমেয়েরা যদি এত সহজে গান গাইতে ও টাকা রোজগার করতে পারে তাহলে সারা দেশের সঙ্গীত শিক্ষার মান ক্রমেই নীচে নামতে থাকবে। সঙ্গীত শিক্ষাদানে তিনি কিছু নিয়ম প্রবর্তনের সুপারিশ করেন :

পরীক্ষা আরও কঠিন করতে হবে।

প্রতিটি বিষয়ের আলাদা পরীক্ষা দিতে হবে।

প্রতিটি বিষয়ের ছয়টি গানের তালিকা দিতে হবে। একটি গান শিল্পী নিজের পছন্দ মতন গাইবে আর একটি গান পরীক্ষকের পছন্দ মত গাইতে হবে। অর্থ এই যে; শিল্পী এই ছয়টি গানই ভালো করে শিখতে বাধ্য হবে।

কোন্ গানটি কার লেখা এবং কে শিখিয়েছে তা জানাতে হবে। যারা পাশ করবে তারা ট্রেনিং সেন্টার থেকে তিন মাসের ট্রেনিং নিয়ে প্রথম ট্রায়েল প্রোগ্রাম পাবে। সুতরাং তিনটি ট্রায়েল প্রোগ্রাম শেষ করতে প্রায় এক বছর সময় লাগবে।

ট্রেনিং সেন্টার থেকে এদের ট্রায়েল প্রোগ্রাম হবে এবং ফি সামান্যই হবে।

এক মাসে এক ঘন্টার প্রোগ্রাম পেলে—একক সঙ্গীত, দ্বৈত সঙ্গীত ও সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অনেক ছেলেমেয়েকে গান গাওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে। এইভাবে নতুন ছেলেমেয়েদের চাপ কম হবে এবং টাকাও কম লাগবে।

এর পরেই যে সকল অযোগ্য ছেলেমেয়েরা প্রোগ্রাম করছে তাদের পরীক্ষা দিতে হবে এবং ট্রেনিং সেন্টার থেকে ভাল করে শিখে পাশ করতে হবে, তারপর আবার প্রোগ্রাম পাবে। মোট কথা তাদের রেডিওতে গান করার সখ ও লোভের সুযোগ নিয়ে ১টি বছর ট্রেনিং সেন্টারে রাখতে হবে এবং আমি জানি তারা খুবই আনন্দের সঙ্গে রাজী হবে;

এমনকি অন্য শিল্পীরাও এই ট্রেনিং সেন্টার-এ ভর্তি হতে চাইবে।

অবশেষে আমি রেডিও ও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাই যে আমি যদি দুইজন সহকর্মী পাই তবে নবাগতদের পরীক্ষা নেওয়া এবং অযোগ্য শিল্পী ছাটাই করা থেকে প্রতিটি ছেলে-মেয়েকে আলাদা করে শিক্ষা দেওয়া ও মাসে এক ঘন্টা প্রোগ্রাম করার সমস্ত ভার গ্রহণ করতে পারি। এই কাজের জন্য অবশ্য তিনটি কামরাসহ একটি বাড়ীর প্রয়োজন।

নজরুল গীতি সম্পর্কেও তার কিছু মূল্যবান সুপারিশ ছিল। তদানীন্তন

রেডিও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে তিনি বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন। সর্ব-সাধারণ্যে তিনি কিছু কিছু সুপারিশও রেখেছেনঃ

ভুল কথা, ভুল সুর, ছেলেমেয়েদের অযোগ্যতা এবং অন্য কবির লেখা গান ইত্যাদির জঞ্জাল থেকে নজরুল গীতিকে মুক্ত করতেই হবে।

রেডিও কি কোনও রকমের ব্যবস্থা করেন নি বা করতে পারেন নি যাতে গাইবার আগে গানগুলো পরীক্ষা করে দোষত্রুটি সংশোধন করা যায়।

বহু স্বরলিপি, গানের বই, সংকলন ও রেকর্ড বাজারে বেরিয়েছে। প্রতিদিন আমার সুরের কিছু কিছু গান শোনা যায় এবং আমার সুরের অন্য কবির গান নজরুল গীতি হয়ে যায় কিন্তু কর্তৃপক্ষ একেবারে নীরব।

আমি ছয় বছর যাবৎ ঢাকায় রয়েছি এবং রেডিওতে আমার সুরকরা গানগুলোর কথা ও সুর ভুল হচ্ছে শুনছি কিন্তু আমি কিছুই করতে পারছি না। এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে জানি না। কর্তৃপক্ষ কি আমাকে দিয়ে গানগুলো উদ্ধার করে সংশোধন করাতে পারেন না?

প্রোগ্রামের আগে একদিন এসে গানগুলো শুনিয়ে কথা ও সুর ঠিক করে দিতে হবে।

যে শিল্পীর যে ধরনের গান গাইবার যোগ্যতা নেই তাকে সেই গান গাইতে দেওয়া হবে না। এইভাবে বাধা না দিলে কিছুদিনের মধ্যেই বেশ কিছু গান অশ্রাব্য হয়ে উঠবে।

সত্যি গজল গানগুলো এখনি সেই অবস্থায় এসে গেছে। দিনের পর দিন মাত্র দুটি লাইনের সুরে সম্পূর্ণ গানটি গাওয়া হলে এক ঘেয়ে হতে বাধ্য। শিল্পী নিজের যোগ্যতা দিয়ে এই একঘেয়েমী দূর করতে না পারলে গজল গাওয়াই বৃথা।

নজরুল গীতিকে তার প্রকৃত রূপে বাঁচিয়ে রাখা একটি মহান কর্তব্য এবং রেডিও ও টেলিভিশনের সহযোগিতায় ও ব্যবস্থাপনায় সে কর্তব্য পালন করা সম্ভবপর।

আমার মনে হয় নজরুল গীতির যতগুলো বই, স্বরলিপি ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর সাহায্যে বর্ণানুক্রমে যদি একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায় তা'হলে এই ধরনের ভুলকথা ও অন্য কবির গান খুব সহজেই সংশোধন করা যাবে। কারণ কবির প্রায় সমস্ত গান আজ ছাপার অক্ষরে ধরা পড়েছে।

এই জাতসঙ্গীত বিশারদের নজরুল গীতির প্রতি কি পরিমাণ দুর্বলতা ও মমতা তা প্রনিধানের জন্য ছিল বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক মহাকর্মাধ্যক্ষকে লিখিত তাঁর একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করা যায় ঃ

আমি কতগুলো নতুন ধরনের প্রোগ্রাম করতে চাই। সহকর্মী হিসাবে দীর্ঘ ১০/১২ বছর আমি ও নজরুল কিভাবে কাজ করেছি, কেন তিনি আমাকে তাঁর গানে স্বাধীনভাবে সুর করার অধিকার দিয়েছিলেন, কি কি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলাম ইত্যাদি। কেমন করে অল্প সময়ের মধ্যে পেশাদার গায়ক গায়িকারা (ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলাঝরিয়া ইত্যাদিরা) বিশ্রাম নিলেন যখন আমার সুরের আধুনিক গান গেয়ে (সেই সময়ের) সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেমেয়েরা জনপ্রিয় হতে থাকলো ইত্যাদি। তারপর আসবে নজরুল গীতির রাগপ্রধান ঠুমরী ও গজল কিভাবে গাওয়া উচিত এবং কিভাবে গাওয়া হচ্ছে। আমি নিজেই গান গেয়ে দেখাব কতখানি যোগ্যতা থাকলে শিল্পীরা নিজস্ব চিন্তাধারার সাহায্যে একঘেয়ে গজলকে নতুন অলঙ্কারে সাজিয়ে নতুনরূপ দিতে পারেন। এই সাক্ষাৎকার প্রোগ্রামটা তুমি আমাকে করতে দাও। কারণ আমি ছাড়া নজরুলের কর্মময় জীবনের শেষ ১০/১২ বছরের কথা আর কেউ বলতে পারবে না।.....সত্যিই তুমি আমাকে দিয়ে নজরুলের বিষয়ে কথা ও গানগুলো যদি করিয়ে না রাখ তবে আমি চলে গেলে নজরুল গীতি কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা পরে বুঝতে পারবে।

তাঁর সঙ্গীত শিক্ষাদানের পদ্ধতিটি ছিল আন্তরিক। তিনি ছাত্রছাত্রীদের আপন করে নিতেন।

শ্রীমতী কানন দেবীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ সবারে আমি নমি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ "গান তুলতে গিয়ে মানুষটির পরিচয় পেয়ে আরো বেশী মুগ্ধ হলাম। এত বড় গুণী, কিন্তু কি সাদাসিধে সরল মানুষ। কি বেশভূষায় কি আচরণে বোঝবার উপায় নেই উনি এত বড় প্রতিভার অধিকারী। ওঁকে চেনা যায় ওর গানের সুরে আর শেখানোর ঐকান্তিক যত্নে। ওঁর যে গুণটি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল সেটি ছিল এই যে, যাকে শেখাচ্ছেন তার মতামত ও সাজেশনকেও যথেষ্ট মূল্য দিতেন। কোন জায়গায় আমি যদি বলতাম মীড়টা এইভাবে দিলে কেমন হয়? কিংবা থামাটা আগে, বা পরে? উনি সোৎসাহে বলতেন, চমৎকার! এটা আরো সুন্দর হলো।

কমল দাশগুপ্ত যে বড় শিক্ষক ছিলেন তা তাঁর ছাত্রছাত্রীদের তালিকা থেকেই বোধগম্য হয়। তিনি চার দশক বহু সঙ্গীতপিপাসু, সঙ্গীতবোদ্ধা, সঙ্গীত রসিক, শিক্ষার্থী তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন। সে তালিকা নিশ্চিতভাবে দীর্ঘ। একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা :

শ্রীমতী যূথিকা রায় (যিনি আজীবন কমল দাশের সুরে গান গেয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত), শ্রী জগন্ময় মিত্র, শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রী সত্য চৌধুরী, শ্রী গৌরী কেদার ভট্টাচার্য, জনাব তালাত মাহমুদ (তপনকুমার), জনাব আব্বাসউদ্দিন, ফিরোজা বেগম, শ্রীমতি রবীণ মজুমদার, শ্রী অসিতবরণ, শ্রী অশোক কুমার। শ্রী পাহাড়ী স্যানাল, শ্রী মান্না দে, শ্রী শ্যামল মিত্র, শ্রী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী (মাদ্রাজ), শ্রীমতী উৎপলা সেন, শ্রীমতী প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র, শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার, শ্রীমতী ইলা ঘোষ, শ্রীমতী কল্যাণী মজুমদার, শ্রীমতী শান্তা আপ্তে (বোম্বে), শ্রীমতী বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার, শ্রীমতী আলপনা ব্যানার্জি, শ্রীমতী শীমা সরকার, শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, শ্রীমতী আঙ্গুর বালা, শ্রীমতী ইন্দুবালা, শ্রীমতী কমলা ঝরিয়া, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীমতী রাধা রাণী, শ্রীমতী সতী দেবী, শ্রীমতী আচার্যময়ী, মিস্ প্রমোদা, কে. মল্লিক, মঃ কাশেম, এ. টি. কানন ও শ্রী প্রসুন ব্যানার্জী।

কানন দেবী আরো বলেছেন : যত চেষ্টাই করোনা শেষ পর্যন্ত দেখবে কমল দাশগুপ্তের ঘর ঘুরে না এলে কিছুই হবে না।

ঢাকায় কমল দাশগুপ্ত

কমল দাশগুপ্তের শেষ জীবন ঢাকায় কেটেছে। ১৯৭৪-এর ২০শে জুলাই ঢাকার পিজি হাসপাতালে তাঁর ইহলোকের বন্ধন ছিন্ন হয়।

পত্নী ফিরোজা বেগমের অনুরোধ ও পরামর্শে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ঢাকায় আসেন। কিন্তু তার প্রত্যাশা নির্মমভাবে ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। জোয়ার ভাটাই যদি জীবন হয় তাহলে বলতে হবে ঢাকায় এসেছিলেন তিনি ভাটার টানে। গুটি কয়েক সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেতার ও টেলিভিশনকে কেন্দ্র করে সঙ্গীতের যে ছোট্ট একফালি

আকাশ এখানে ছিল তাতে কমল দাশগুপ্তের মত মুক্ত পাখী ডানা মেলে উড়তে পারে নি। এ সত্যকে মেনে নিয়েই তিনি চেয়েছিলেন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। কিন্তু তদানীন্তন সরকার এবং পরিমণ্ডলের ফলে সঙ্গীতের এই মহীরুহকে সীমাবদ্ধতার কারাগারে বন্দী থাকতে হয়। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ নাগরিকত্ব লাভ করেন। একটি নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠতেও সময় লাগার কথা। রেডিও টেলিভিশনে সঙ্গীত বিকাশের প্রয়োজনে একটি সুস্থ দীর্ঘ কর্মসূচী নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া তখন অসুবিধাজনক ছিল। কমল দাশগুপ্তের সাঙ্গীতিক আরশীতে এই প্রতিকূল অবস্থা প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। জীবন সায়াহ্নে অর্থাৎ মৃত্যুর মাত্র বৎসরাধিক পূর্বে তিনি বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের প্রধান সঙ্গীত পরিচালক নিযুক্ত হন। এখানেও তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় কর্মসূচীকে অগ্রগামী করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। এই সার্ভিসে অবস্থানকালেই কমল দাশগুপ্ত একুশের জনপ্রিয় গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী' স্বরলিপি করেন।

কর্মনিষ্ঠ এই প্রতিভাধর ব্যক্তিকে যখন সার্ভিসের প্রধান সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান তখন তিনি ম্লান হেসে বিয়োগ ব্যথাতুর কন্ঠে বলেছিলেন: এতদিন পরে এলে! আমাকে ছ'টি বছর কেউ কাজ করতে দেয়নি। কি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আর দেরী করোনা ভাই, কখন ডাক এসে যায় কি জানি। যা পারো সব কিছু নিয়ে নাও: আমায় কাজ করতে দাও।

কমল দাশগুপ্তের একটি বিরাট মহৎ পরিকল্পনা ছিল ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসকে কেন্দ্র করে। যন্ত্রীদল, কর্ণসার্ট হল, শিক্ষাপদ্ধতি, শর্টহ্যাণ্ড নোটেশন কত কী! মহাকাল তাঁকে আর সময় দিল না। এখানে সামান্য যে সময় তিনি পেয়েছিলেন তার মধ্যে ৫০টির মত সৃষ্টি তিনি রেখে গেছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে হামদ, নাত, নজরুলগীতির যন্ত্র সংগীত ইত্যাদি। কমল দাশগুপ্তের জীবনের সর্বশেষ অবদান হলো শুক্‌নো পাতার নূপুর পায়ে ও পথহারা পাখী কেঁদে ফিরে একা, নজরুলের এই দুটি জনপ্রিয় গানের সুরে সমবেত যন্ত্র সঙ্গীত রচনা।

মেথড তিনি অনুসরণ করতেন পুরোপুরি, তাই দেখা যেত স্বরলিপি ছাড়া তিনি কোন প্রডাকশন করছেন না। ঢাকা বেতারকে কেন্দ্র করে

তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হলো না। তার আগেই মহাকাল তাকে বন্দী করলো। মহাকালেরই বা দোষ কী! সে তো ছ' সাতটা বছর উপহারই দিয়েছিল কমল দাশগুপ্তকে! আমাদের সন্দেহ, অশ্রদ্ধা, নিষ্ঠুরতা, অবহেলা তাকে কষ্ট দিয়েছে, অপমান করেছে। তবু আমরা যখন হাত বাড়িয়েছি, দ্বিগুণ গতিতে তিনি তাঁর হাত সম্প্রসারিত করেছেন। একেই বলে বড় মানুষ, মহৎ শিল্পী!

উপমাহদেশের সঙ্গীত সমাজ কমলদাশগুপ্তের কাছে আহরণ করেছে অনেক, চয়ন করেছে বহুবিধ হীরামুক্তা, কিন্তু দিয়েছে কতখানি!

একটা ইনক্রিমেন্ট পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। অসুস্থ অবস্থায় সাধারণ বিভাগ থেকে যখন তাঁকে কেবিনে নেয়ার প্রশ্ন উঠলো, তখন ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইনি গেজেটেড না নন্-গেজেটেড?

গানের সংখ্যা

কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত গানের সংখ্যা কত? এ নিয়ে নানাজনের নানা হিসাব। কেউ বলেন পাঁচ সাড়ে পাঁচ, ছয় কেউ বলেন সাত হাজার ইত্যাদি। আমরা এখানে অধিকতর কর্তৃপক্ষীয় সূত্রের সাহায্য নিচ্ছি। কমল দাশগুপ্তের জীবনের বহু তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বিশিষ্ট লেখক ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রী কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য বলেন: ১৯৭২ সালে নভেম্বর মাসে কলকাতায় ব্রডওয়ে হোটেলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। তিনি আমায় বলেছিলেন তাঁর সুর করা গানের সংখ্যা হবে চার হাজার, যার মধ্যে কাজী নজরুলের লেখা গান হবে চারশোর মত। পরিতোষ শীল, যিনি কমলবাবুর সঙ্গে বেশীরভাগ সময়েই কাজ করেছেন তাঁর মতে কমলবাবুর সুর করা গানের সংখ্যা হবে চার হাজারের বেশী কিন্তু তা পাঁচ হাজারের কম। যদি এ সংখ্যা সঠিক হয়, তবে তা এক রেকর্ড বলতে হবে।

রেকর্ড সংখ্যক গানে সুর করার জন্য ১৯৫৮ সালে এইচ. এম. ভি'তে তাঁর সিলভার জুবিলী অনুষ্ঠিত হয়। এর কিছুদিন পরেই তাঁর গোল্ডেন জুবিলী হওয়ার কথা ছিল। এই সময় লালগোলার জমিদার রাজারা এবং ধীরেন্দ্রকুমার রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীসিনেমা হলে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা ও সম্মান প্রদান করা হয়।

কমল দাশগুপ্ত কেমন মানুষ ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন কোন স্তরের ছিল? কি সব মানবিক গুণরাজী তাকে প্রতিষ্ঠার তুঙ্গে তুলতে সাহায্য করেছিল? কোন যোগ্যতার বলে তিনি গৌরব ও সাফল্যের শীর্ষে উঠতে পেরেছিলেন?

যেসব মৌল গুণাবলী মানুষকে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করে তুলে তার অধিকাংশই তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ, সময়নিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর সৃষ্টিকে অপেক্ষাকৃত সুন্দর, মার্জিত ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য তিনি বার বার সুর পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতেন। তিনি রবার্ট ব্রুস-এর মত অধ্যবসায়ী কিন্তু বিষয়ী ছিলেন না। অর্থের প্রতি তাঁর লোভও ছিল না। বিনয়ী কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। বাঘা শিল্পী অভিনেতা প্রযোজক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে যেমন ভয় করতেন ঠিক তেমনি করতেন শ্রদ্ধা। কমল দাশ গুপ্ত ছিলেন প্রিয়তমা পত্নীর প্রিয়তম স্বামী, স্নেহ বৎসল পিতা, আদর্শ এবং অনুকরণযোগ্য শিক্ষক ও দীনদুঃখীর বন্ধু। ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের সময় তিনি কলকাতায় নিজের খরচে প্রতিদিন একশ করে লোক খাওয়াতেন এবং প্রায় একমাস ব্যাপী তাঁর এই মহোৎসব অব্যাহত থাকে।

মানুষের জীবনে উত্থান পতন, ভাঙ্গাগড়া আছে এবং থাকবে। কোলকাতায় পঞ্চাশের দশকে গ্রামোফোন কোম্পানীর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। ভাগ্য বিপর্যয় ও হতাশায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তার পরিচয় ছিল নজরুল গীতির চীফ ট্রেনার রূপে। ঢাকায় দীর্ঘদিন মানসিক দুঃশ্চিন্তায় তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। কিন্তু শত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনাতেও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল উজ্জ্বল। সময়ের নির্মম প্রহারকে তিনি নীরবে সহ্য করেছেন এবং পারিপার্শ্বিককে মূল্য দিয়েছেন সর্বদা। কমল দাশগুপ্ত আজ নেই। আছে তার সুর, সঙ্গীতরাজি, মুর্ছনা-মীড়; রয়েছে তার আদর্শ এবং শিক্ষা।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী তাঁর প্রতিভা ও অবদানের মর্যাদা স্বরূপ তাঁকে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁকে পূর্ণ সম্মান আমরা তখনই দেব যখন সঙ্গীতে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করব।

কমল দাশগুপ্ত বরেণ্য শিল্পী জগন্ময় মিত্রকে দিয়ে হিন্দুস্তান রেকর্ডে গাইয়েছিলেন তার জীবনের সর্বশেষ নজরুল গীতিটি। নজরুলের কথায়

তিনি যেন নিজের কথা বলে গেছেন :

খেলা শেষ হলো—শেষ হয় নাই বেলা—
কাঁদিও না, তব তরে রেখে গেনু প্রেম-আনন্দ-মেলা ॥
খেল খেল তুমি আজো বেলা আছে—
খেলা শেষ হলে যেয়ো মোর কাছে,
প্রেম যমুনার তীরে বসে রব লইয়া শূন্য ভেলা ॥
যাহারা আমার বিচার করেছে ভুল করিয়াছে জানি
তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর বিদায়ের গানখানি।
হোক অপরাধ, হোক মোর ভুল
বালুকার বুকে ফুটায়েছি ফুল
তুমিও ভুলিতে নারিবে সে কথা হানো যত অবহেলা ॥